২

প্রান্তিক মানুষের দরদি কথাকার

রাহুল দাশগুপ্ত

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একজন দরদি কথাকার। মূলত প্রান্তিক মানুষ এবং জীবন নিয়েই তিনি গল্পগুলি লেখেন। কিন্তু সেই লেখা গতানুগতিক নয়। তিনি জীবনের একটা টুকরো অংশ তুলে আনেন। খুবই মামুলি, তুচ্ছ একটি অংশ। কিছুই ঘটে না সেখানে। কিন্তু সেই মামুলি ব্যাপারস্যাপারের মধ্য থেকেই ঘটতে থাকে বিস্ময়কর সব উন্মোচন। চলতে থাকে জীবন ও মানুষকে আবিষ্কার। খুব অনুপুঙ্খ, খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর গল্পগুলিতে— মানুষের, পরিবেশের, চরিত্রের, ভঙ্গির, পোশাকের, আচরণের। মানুষ ও জীবনকে তিনি খুব গভীরভাবে দেখতে জানেন। তাঁর দেখার চোখ খুবই অন্তর্ভেদী। খুব মামুলি, তুচ্ছ, সাধারণ জীবনের মধ্য থেকেও তিনি জীবনের ঐশ্বর্য ও সম্পদকে খুঁজে পেতে জানেন। কিন্তু তিনি শুধু বিবরণ দেন। কোনও মন্তব্য করেন না। কোনও বক্তব্য রাখেন না। কিন্তু এমনভাবে বিবরণ দেন, তাতেই পাঠক আলোড়িত হতে থাকেন। কারণ, তিনি যেভাবে দেখান, তার মধ্যেই বিশিষ্টতা ও মৌলিকতা থাকে। অতি মামুলি জীবনের পরিবেশনে যে এমন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়া যায়, তা দেখে অবাক হতে হয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ, 'দ্রৌপদীর থান'। 'দ্রৌপদীর থান' গল্পটিতে, বিচ্ছেদের ন-বছর পর কন্যার জন্মদিনে মাকে একবারের জন্য হাজির করার বায়না মেটাতে মুসলমান বাবা মতিয়ুর তার জেদি হিন্দু স্ত্রী লীনাকে বাড়িতে আনার জন্য নিজের ছোট একটা পৈতৃক আমবাগান দানের দলিল হাতে নিয়ে একসময়ের শ্বশুরবাড়িতে তাকে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করে, তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী রোজ সন্ধেবেলা যুধিষ্ঠিরের মন্দিরের পাশে দ্রৌপদীর থানে যায়। দু'চোখে ছানি পড়া তার প্রাক্তন শ্বশুরের মুখে দ্রৌপদীর থানের কথা শুনে মতিয়ুর অবাক। যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী আজও আছে নাকি! শ্বশুরের উত্তর— শকুনি, দুর্যোধন, দ্রৌপদী, পাশাখেলা, যুধিষ্ঠিরের সত্যের আবরণে মিথ্যা উক্তি মহাভারতের সব আজও আছে। সেখানে অন্ধকারে এক সাইকেল আরোহীর কাছে দ্রৌপদীর থান যে আসলে গ্রামের পতিতালয় সেকথা শুনে মতিয়ুর স্তম্ভিত। তার একমাত্র মেয়েটির পরিণতি যাতে তার মায়ের মতো না হয়, সেই দুশ্চিন্তায় শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায় তার বাবা। এ যেমন নারী-পুরুষের গল্প, তেমনই পিতা ও সন্তানের গল্পও বটে। আবার হিন্দু-মুসলমান

প্রসঙ্গও এসেছে আলগাভাবে। ছোট্ট একটা গল্প এইভাবেই বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে।

পাগলামির প্রসঙ্গ এসেছে 'পাগল-ছাগলের কথা' গল্পেও। দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, খান-সেনাদের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে যায় এক বিদগ্ধ মানুষ। তাঁর সমস্ত স্মৃতি লোপ পায়। সেই পাগল মানুষটির প্রতি সমবেদনা বোধ করা দুই নারী পরস্পরের মুখোমুখি হয় গল্পের শেষে। একজন তাঁরই পলাতক কন্যা, আরেকজন নিউরোলজির ডাক্তার। আপাতভাবে যাকে উন্মাদ বলে মনে হয়, তার ভিতর থেকে এক আশ্চর্য মানুষকে আবিষ্কার করার এই গল্প যেন দেখাতে চায়, বিক্ষিপ্তভাবে একজন ব্যক্তিমানুষকে বিচার করা ঠিক নয়, তাকে একটা ইতিহাসের অংশ হিসাবেই দেখতে হবে। 'লেখকের মৃত্যু' গল্পটি দ্ব্যর্থবোধক। এই গল্পে এমন এক লেখকের কথা আছে, যিনি মনে করেন, 'একেকটা বই একেকটা প্রদীপ, অন্ধকারে মানুষকে পথ দেখায়!... এমন বইও পৃথিবীতে লেখা হয়েছে, যা আসলে একটা মশাল।' সেই প্রদীপ বা মশালের মতো বই-ই লিখতে চান এই লেখক। 'আকাশের চিল আর বৃক্ষকোটরের প্যাঁচার মতো' নিজের চোখে যা দেখে তাই লেখার ইচ্ছে তাঁর। তাঁর উপন্যাসের নাম 'শ্যামনগরের সক্রেটিস', কিংবা 'বিলু সোরেনের দাওয়ায় পান্তা খেলেন গৌতম বুদ্ধ।' কিন্তু তাঁর কোনও ক্রেতা নেই, সে বাজার-চলতি, জনপ্রিয় লেখকদের মতো গল্প উপন্যাস লিখতে পারে না। 'পিংপং বলের মতো' সহজ সংলাপপ্রধান লেখার ক্ষমতাই তার নেই। অগত্যা অন্যের বই বিক্রি করে তাঁকে সংসার চালাতে হয়। শেষপর্যন্ত তাঁর আত্মিক এবং শারীরিক, দু'রকম মৃত্যুই ঘটে।

'আমাদের বাড়ি রেললাইনের ধারে' গল্পে রয়েছে রেললাইনের ধারের একটি বাড়ির কথা, যা একই পরিবারের নানা বিচ্ছেদ ও মিলনের সাক্ষী হয়ে থাকে। এ গল্প একদিকে যেমন পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের, তেমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নারী-পুরুষের। 'মহেশতলার ধর্মযুদ্ধ' একটি দুর্দান্ত গল্প। দুটি মেয়ে, মুসলমান ফরিদা এবং হিন্দু সাবিত্রী, আজন্ম একে অপরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সমাজ, পরিবার, বিবাহ, পুরুষ, তাদের বারবার একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু কোনও অত্যাচারই তাদের আলাদা করতে পারে না, তারা বারবার একে অপরকে খুঁজে নিতে থাকে, নিজেদের জন্য আবিষ্কার করে নিতে থাকে ধর্মান্ধতাহীন এক যৌথ পরিসর, এক গোপন, নির্জন সার্বভৌম দেশ। তাদের মনে হয়, 'এই শ্বাসপ্রশ্বাস কি মুসলিম না হিন্দু? তোর আমার মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ব্যথা, এসব কি হয় হিন্দু, নয় মুসলমান?' শেষপর্যন্ত নদীতে দুজনের দুটি শব পাশাপাশি পরস্পরের গায়ে লেগে থাকে, একজন বোরখা পরা, অন্যজন শাড়ি পরা। দু'জনের একটি পা আরেকজনের একটি পায়ের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। এই গল্প সেই সার্বভৌম দেশ খোঁজার গল্প, সেই সার্বজনীন মানবতা খোঁজার গল্প, যেখানে ভালোবাসা আর মনুষ্যত্বই একমাত্র শর্ত, ধর্মের পীড়ন যেখানে পৌঁছতে পারে না। পারস্পরিক ভালোবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি এই দুই নারীকে উভয় সম্প্রদায়ের কট্টর ধর্মরক্ষকরা হত্যা করেছে না এরাই মনের যন্ত্রণায় দুঃখে আত্মহত্যা করেছে, লেখক সে বিষয়ে একটি শব্দ খরচ করেননি। ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গারে ভয়াবহ ধর্মদূষণের চিত্রটি শুধু সারা গল্প জুড়ে এঁকেছেন।

'বাখরখানি' গল্পটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আর একটি চমৎকার উদাহরণ। মধ্যবয়সি বাবা তার ছেলেকে নিজের শৈশবে ছেড়ে আসা দেশ চেনাতে নিজের জন্মভিটেতে নিয়ে যায়। ঢাকা থেকে বরিশাল যাওয়ার সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে। বাবা কিন্তু মনে মনে বহন করে চলেছে এক গোপন স্মৃতি। ছেলেবেলায় দেশ ছেড়ে যাবার সময় তার মুসলমান বন্ধু মইনুলকে সে কথা দিয়েছিল, দেশে সে ফিরে আসবে, আর মইনুলের জন্য বাখরখানি নিয়ে আসবে। সেই প্রতিজ্ঞা সে রাখে। ঢাকা থেকে কিনে নেয় বাখরখানি। হিন্দু বন্ধুর হাত থেকে বহু বছর পর বাখরখানি পেয়ে মইনুল বলে ওঠে, 'আল্লাহ তাইলে সত্যই আছে ক!' সন্তান অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চোখে এভাবেই দুই ধর্মের দুই প্রবীণের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আর একটি চমৎকার উদাহরণ, 'শশাখেতের বেড়া' গল্পটি। শশাখেতে দুই কিশোরের শশা চুরির মতো সামান্য একটি ঘটনা নিয়ে এ এক অসামান্য গল্প। শশা চুরি করতে গিয়ে হাশেম আর সতু হঠাৎ পেছন থেকে খেতমালিক গৌরনিতাইয়ের তাড়া খেয়ে পালাবার জন্য সামনের দিকে ছুটতে থাকে। ওদের মনে ছিল না, হিন্দু আর মুসলমানের খেতের জমির মাঝখানে রয়েছে পাতলা তারের জালের টানা বেড়া। পালাতে গিয়ে সেই বেড়াতেই ওরা ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। এই বেড়া প্রতীকী। ওদের ধরতে একদিক থেকে তেড়ে আসে হিন্দু খেতমালিক গৌরনিতাই, আরেক দিক থেকে তেড়ে আসে মুসলমান খেতমালিক জামালউদ্দিন। সেই বিপদে হিন্দু ও মুসলমান দুই কিশোর একে অপরকে জড়িয়ে-মড়িয়ে বেড়ার গায়ে অন্ধকারে মিশে শুয়ে থাকে এবং বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। ধর্মের বাধা তখন উধাও হয়ে যায়, শ্রেণিশত্রুর আগ্রাসন থেকে দুই কিশোরকে রক্ষা করে তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, ধর্মান্ধতা সেখানে অর্থহীন হয়ে যায়।

'জাল' একটি প্রেমের গল্প। জুনপুটে সেবছর ভালো মাছ না পাওয়ায় কুঞ্জর বিয়ে করার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছিল। ফিশারিজবাবুর বাড়ির কাজের মেয়েটি সৈকতে কুঞ্জর কাছে মাছ কিনে নিয়ে যায়। কয়েকদিন তাকে সৈকতে না দেখে, সে উদ্বিগ্ন হয় ও ফিশারিজবাবুর বাড়িতে মেয়েটির খোঁজ করতে যায়। মেয়েটি তখন চিকেন পক্স হওয়ায় সিঁড়ির নীচে অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে। ফিশারিজবাবু তাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। কুঞ্জের মন বুঝতে পেরে ফিশারিজবাবুও চমৎকার অভিনয়ের জালে কুঞ্জকে বাঁধেন ও মেয়েটিকে তার গাঁয়ের বাড়িতে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করেন। কুঞ্জও আনন্দে সেই ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

'ডাবের জল' গল্পে এক হিংস্র পৃথিবীর ছবি ফুটে ওঠে সন্তানের চোখে। গঙ্গায় ভেসে যাওয়া তার হিন্দু মায়ের জীবন এক মুসলমান জেলে বাঁচিয়েছে বলে, পুত্রের সামনেই তাকে মারধর করে তার হিন্দু বাবা। যেন মায়ের জীবনটা নয়, এখানে বিধর্মী পরপুরুষের স্পর্শটাই বড় হয়ে উঠল। খুব ছোট থেকেই সে দেখে আসছে তার মায়ের ফিটপড়া রোগ বাড়ির নারকেলবাগানের ডাব খাইয়েই সারিয়ে তোলা যায়। ছেলের বিশ্বাস ছিল, ডাবের জল খেলেই মা ভালো হয়ে যায়। এবার জল থেকে তুলে তাকে ডাবের জল খাইয়েও আরাম দেওয়া গেল না। কিন্তু এই রোগ, সমাজের এই ভয়াবহ রোগ, সাম্প্রদায়িকতার এই বিষ যেখানে ছড়িয়েছে, ডাবের জল সেখানে কোন কাজে

আসবে? ডাবের জল এই গল্পে তাই প্রতীকী অর্থেই এসেছে, কিন্তু এই মোক্ষম প্রতিষেধকও যেন এই গল্পে আরোগ্য আনতে ব্যর্থ হয়, মার খাওয়া মা বমি করে ছেলের দেওয়া ডাবের জলটা মুখ থেকে বার করে দেয়।

'ইউক্রেনের আয়না' গল্পটিও একটি প্রেমের গল্প। ইউক্রেনের এক নারী ভালোবেসে ফেলে এক বাঙালি যুবককে এবং তাকে দেয় এক আশ্চর্য হাত-আয়না, সঙ্গে রুশ ভাষায় লেখা একটি চিঠি। দেশে ফিরেও বিদেশি মেয়েটিকে ভুলতে পারে না যুবকটি এবং একদিন সেই দেশে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়ার বাসনা মনে মনে বহন করে চলে। যুবকটির ওই দুর্বোধ্য আয়না ও চিঠির অর্থোদ্ধার করতে চাওয়ার নিরন্তর প্রয়াসের মধ্যেই আছে গল্পটির মজা। 'অন্ধ হবার পরে' গল্পটি একদা চক্ষুষ্মান, কিন্তু বর্তমানে অন্ধ হয়ে যাওয়া একজন মানুষের একটু একটু করে জীবনকে আবিষ্কার করার গল্প। 'শকুন' গল্পটিতে দরিদ্র একটি ছেলে তার বোন এবং মাকে নিয়ে একটি নতুন বাড়িতে পৌঁছয়। তিনজন তিনভাবে এই নতুন বাড়িটিকে গ্রহণ করে, মেয়ের মন হতাশায় ভরে যায়, মা ও ছেলে আশাবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় তালগাছে একটি শকুনের উপস্থিতি মায়ের মনকেও বিরূপ করে তোলে। গোটা গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে মনস্তত্ব এবং পরিবেশ বর্ণনার ওপর। 'বাড়িতে অসুখ' গল্পে দরিদ্র ভাই কিছুতেই তার ধনী দিদির বাড়িতে এসে হাত পেতে টাকা ধার চাইতে পারে না। গল্পের আগাগোড়া দিদির কাছে সে নিজেদের করুণ, ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়েও মুখ ফুটে টাকার কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না। তার অনুচ্চারিত স্বীকারোক্তিই গল্পটিকে এত করুণ করে তুলেছে।

'বারোপাতার ঝিঙে' গল্পে জীবনে যখন আনন্দ থাকে, তখন মাঝরাতের বাঁশির আওয়াজ শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। জীবন যখন তিক্ত, তখন বাঁশির আওয়াজকেও যেন সহ্য করা যায় না। 'মেসের খাটিয়া' গল্পে দুই বন্ধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, যা বারবার মৃত্যুর স্বপ্নের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। 'বাড়ি' একটি অদ্ভুত গল্প। বাড়ি কিনতে গিয়ে নির্মমভাবে প্রতারিত হয় বাবা। প্রতারককে খুঁজতে গিয়ে ছেলে আবিষ্কার করে বাড়িটার পিছনের জঙ্গলে একটি শিয়ালের গর্ত, যার মধ্যে বসবাস করে একটি ছেলে এবং তার মালিকের নির্দেশে বাড়িটির ওপর নজর রাখে। মালিক ক্রেতার কাছ থেকে বাড়ির দামের অর্ধেক আগাম নিয়ে নদী পেরিয়ে কোথায় চলে যায়। একবছরের মধ্যে আর আসে না। পরে আবার একই ভাবে বিজ্ঞাপনের ফাঁদ পেতে নতুন ক্রেতা ধরে তাকেও ঠকায়। গল্পের এই প্রতারিত পরিবারটি প্রায় উদ্বাস্তু হয়ে বেশ কিছুদিন থাকার পর শেষ পর্যন্ত তাদের একটি নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ হয়। এই বাড়িতেই ভোটের সময় পিতার সামনে খুন করা হয়েছে পুত্রকে এবং পিতা তাই জলের দরে বাড়িটি বেচে দিতে চান। একজন শোকাহত পিতার অসহায়তার মূল্যে আর এক অসহায় পিতা শেষ পর্যন্ত ব্যথিত বিষণ্ণ হৃদয়ে বাড়িটি কিনতে বাধ্য হন।

তাঁর সব গল্পেই জীবনের আশ্চর্য সব দিক আবিষ্কার করার ক্ষমতা রয়েছে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর। এর আগেও তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম 'নিমফুলের মধু'। 'নিমফুলের মধু' গল্পে নিমফুলের মধু বিক্রি করেই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায় নকুল। একটা অংশ না বললে গল্পটার হৃদয় ছোঁয়া যাবে না:

'চণ্ডী পাশের ঘরে মাটিতে আঁচল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মারামারিতে তার ঘুম ভাঙেনি। নকুলের চড়-ঘুষিও তার কানে যায়নি। সব যখন চুপচাপ, নকুল সন্ধেয় কেনা ছ'টা বিড়ির প্রথমটা সবে ধরিয়ে ওঘরে ঢুকেছে, চণ্ডী ধড়ফড় করে উঠে বসল। এক মুহূর্ত অদ্ভুত চোখে নকুলের দিকে চেয়ে থেকে তার ঘোর ভাঙল, ''বাব্বা! যা একখানা স্বপ্ন দেখছিলুম!''

কে বলবে নকুল একটু আগেই নিজের ছেলেমেয়েদের মারধর করেছে, বিড়িতে ছোট একটা টান দিয়ে বলল, ''কী?''

—'' দেখলুম ভাত পুড়ে যাচ্ছে। চাল এনেছো?''

—''অনেকদিন পর লটে মাছ পেলুম। বেশ ঝাল দিয়ে রাঁধো তো গিয়ে।''

দু-ঘরের মাঝখানে একটা মাত্র কুপি। তেল কমে গিয়ে দপ-দপ করছে। চণ্ডী সেদিকে একবার তাকিয়ে বলল, ''তেল ভরতে হবে। কেরাসিন এনেছো?''

নকুলের বিড়ি নিভে গিয়েছিল, নিচু হয়ে কুপি থেকে ধরিয়ে নিয়ে বলল, ''একটু পড়েই চাঁদ উঠবে। আজ ওতেই একরকম চলে যাবে। কাল কেরাসিন আনব।''

... খেয়ে উঠে বিড়ি ধরাবার উপায় নেই, কুপি অনেকক্ষণ নিভে গেছে। উনুনের পোড়া কাঠ-পাতায় জল ঢালা। নকুল বিড়িহাতে চণ্ডীর পিছনে এসে দাঁড়ায়, ''ঘরে দেশলাই নেই?''

—''জোছনায় ধরাও গিয়ে!''

গল্প যতই এগোয় এই দীন দৈনন্দিনেও জেগে থাকা দাম্পত্যচিত্র অন্ধকারে কেরোসিনের কুপির মতো জ্বলে।

'চাঁদ গাবগাছ ছেড়ে সুপুরিবনের দিকে যাচ্ছে। দাওয়ায় বসে চণ্ডীর থালাবাটি ধোওয়ার শব্দ আর তার গোঙানি শুনতে শুনতে নকুল বিড়ির আগুন থেকে আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে ঘন-ঘন টানতে থাকে।

চণ্ডীর হাতের হাজা ছাই-জল লেগে জ্বলছে, তার ওপর অন্ধকারে একটা ভাঙা বাটির কানায় লেগে তার হাত কেটে গেছে, সে কোঁকাতে-কোঁকাতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই নকুল খিঁচিয়ে উঠল, ''আঃ তাড়াতাড়ি সার না ঘরামীর মেয়ে!''

'ঘরামীর মেয়ে' নকুল রেগে আর আদর করে— দু-অবস্থায়ই বলে। ঘরে ঢুকে চণ্ডীকে নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে এবার নকুল অন্যরকম গলায় বলল, ''ঘরামীর মেয়ে! ছাগল দুধে কালোজামের মধু মেরে তোকে খাওয়াব, দেখিস।''

'গৃহ' গল্পে সন্ন্যাসী বাবা বহুদিন পর বাড়িতে এলে, তার প্রতি ছেলের তিক্ত মনোভাব ক্রমে বদলে যায়। গল্পের শুরুতেই দেখি:

'ভোরবেলা বাবা এলেন, মাথার জট এবার আরও বেড়েছে। হাতে কচি কচি চারটে সজনে ডাঁটা।

এর আগে যেবার এসেছিলেন, সেবার এনেছিলেন চারটে সবেদা। মায়ের, আমার, নীলুর, আরেকটা নিজের জন্য। এবারও চারটে। বাবা তো আর জানতেন না, নীলু জেলে।

বাবার ডাক শুনেই মা আমার ঘুম ভাঙান। মাথায় কাপড় দিতে দিতে বললেন, ''দরজা খোল তো।'' বলে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে বাবার চোখে চোখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবার মাথার ওপর দিয়ে দেখলাম আকাশে তখনও শুকতারা জ্বলজ্বল করছে।

বাবা বললেন, ''ঘুমোচ্ছিলে?''

কথার উত্তর না দিয়ে মা শুধু বললেন, ''ভেতরে এসো।''

কিংবা 'বাবা দাড়ির জটে হাত বোলাচ্ছেন। জট ছাড়াচ্ছেন না, হাত দিয়ে জটগুলো যেন অনুভব করছেন। আমি চলে যাচ্ছি দেখেও বললেন, ''মলুর জীবনে অনেক জট পড়েছে। সেসব না ছাড়িয়ে অন্যের জীবনে এখনই ওর জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।''

ঘরে বসে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে নীলুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখতে লিখতে মায়ের গলা শুনলাম, ঝাঁঝ চাপতে পারেননি, ''বত্রিশ বছর বয়েস হল, ওকেও কি সন্ন্যাসী বানাতে চাও নাকি?''

বাবার গলা এবারে বেশ মৃদু। বললেন, ''অনুপযুক্ত হাতে সংসার করতে গেলে সংসার নরক হয়ে ওঠে।''

সন্ন্যাস ও সংসারের মধ্যেকার গভীর ও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে গল্পটি বোনা। গল্পের শেষে—

'সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই বাবার ভজন কানে এল। ভরাট, সুরেলা গলা। হিন্দি উচ্চারণও পরিষ্কার।

গান আসছে বাগানের দিক থেকে। এগোতেই চোখে পড়ল বাবা চোখ বুজে দুলে দুলে গাইছেন। মা পাশে বসে আছেন। ঠিক একটা মূর্তি। জ্যোৎস্নায় আমগাছের বউল চকচক করছে।

''আপনাকে চা দিই দাদাবাবু?'' পিছনে লক্ষ্মী এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবার চোখ খুলে গেল। ভজন সমে এসে পৌঁছেছে, আমার দিকে চেয়ে থেকেই শেষ করলেন।

গান শেষ হতেই মা মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। যেন ঘোর থেকে উঠে এলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে আসতে আসতে বললেন, ''ভাবাতেও পারিস বটে। গেলি তো গেলিই। সারাদিন একটা খবর পর্যন্ত নেই। ঋতুও এল না। খেলি কোথায়? ওর ওখানেই গিয়েছিলি বুঝি?''

কিছু না বলে আমি হাসলাম।

বাবা বললেন, ''অত ব্যস্ত হও কেন? সংসার তো মায়ের আঁচল নয়!''

আমি বললাম, ''আপনি এবার কতদিন থাকবেন?''

বলতে চেয়েছিলাম, এবার কিছুদিন থেকে যেতে পারেন না?'

'হাতেখড়ি' একটি ছোট্ট দরিদ্র মেয়ের গল্প, সরস্বতী পুজোর দিন সে হাতেখড়ির স্বপ্ন দেখে এবং শ্লেট কেনার পয়সার জন্য বাইরের দুনিয়ার ইতরজনের কুদৃষ্টির পরিচয়ে কুঁকড়ে যায়। 'ধুলো' গল্পে ধুলোর বাতিকগ্রস্ত এক মধ্যবিত্ত বাঙালির সংসার জীবনের মর্মান্তিক চিত্র। স্বামী এক দুঃসহ অসহায়তা নিয়ে ফুঁসতে থাকে। 'সন্ন্যাসীর পুঁথি' গল্পে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে সমস্ত আদর্শ ও নৈতিকতাকে বিসর্জন দেওয়া না-দেওয়ার দোলাচলে দিশেহারা এক হায়ার সেকেন্ডারি পাশ তরুণ কৃষকপুত্রের হাহাকার শোনা যায়। এই গল্পের টুকরো টুকরো অংশে ফুটে উঠেছে মানুষের ভয়াবহ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, সেই অসহায়তা থেকে নিজেদের বাঁচানোর দুর্মর আকাঙ্ক্ষা এবং লোভ। বিভিন্ন চরিত্রের কোলাজ রয়েছে গল্পটিতে, রয়েছে পরিবেশের খুঁটিনাটি বর্ণনা, সবমিলিয়ে গল্পটি হয়ে উঠেছে গ্রামজীবনের এক প্রামাণ্য দলিল।

'শেতলের খিদে' একটি উদ্ভট গল্প, যেখানে একমুঠো ভাত জোটাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর পাইওরিয়া দুষ্ট নিজের দাঁতের ফাঁক থেকে জিভ দিয়ে টানা রক্তেই নেশা ধরে যায় শেতলের এবং খিদে পেলে ক্রমশ মানুষের রক্তই হয়ে ওঠে তার কাছে খিদে মেটানোর একমাত্র উপায়। 'ভয়' গল্পে গতানুগতিক জীবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে সত্যেন, কিন্তু নিরাপত্তা হারানোর প্রবল ভয়ই আবার তাকে চেনা বৃত্তে ফিরিয়ে আনে। 'শোধ তোলা' গল্পের বিষয় মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি, বাড়ির চাকরের টাকা অজান্তে নিয়ে অফিসে গিয়ে নিজের দৈন্য ঢাকতে ফুটানি মারে প্রদীপ, কিন্তু চাকর সহদেবের কাছে সেকথা স্বীকার করার সৎসাহস তার নেই। 'মানুষ-মুনিষ' গল্পে একটি মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, তার মৃতদেহ বহন করার ঘটনাকে সামনে রেখে যেন একটি পরিবারের বিভিন্ন মানুষের, সমাজের বিভিন্ন স্তরের পোশাকগুলো খুলে যেতে থাকে, তাদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। 'ঠাকুরদার বাড়ি' গল্পে রয়েছে একটি বড় যৌথ পরিবারের টুকরো টুকরো হয়ে অনিবার্য ভেঙে যাওয়ার কথা। 'নৌকোবদল' গল্পে নৌকোবদল হয় নীলকণ্ঠর, সে যাচ্ছিল যাত্রা দলের বাঁশি-বাজিয়ে লোকটির বিকল্প আনতে, আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, সে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, ফলে বাধ্য হয়ে তাকেই তোলা হয় শহরের হাসপাতাল যাত্রী সেই রোগীর নৌকোয়।

'হলদি নদীর তীরে' চার বন্ধুর গল্প, মধ্যবিত্ত ভণ্ডামির চরমে পৌঁছয় তাঁরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিকারি অবস্থা পরিবর্তনে শিকার বনে যায়। 'ছোঁ' গল্পে রয়েছে দারিদ্র্যের নির্মম ছবি, মানুষের অসহায়তার সুযোগে মানুষের লোভ কতটা কদর্য হয়ে ওঠে তার বর্ণনা। 'বুকজলে' গল্পে রয়েছে এক পিতার বিপন্নতার কথা, যার নির্মীয়মাণ বাড়ি বুকজলে ভেসে গেলে, সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে অসহায় বোধ করে। 'ঘোড়াদহের মাঠে' একটি চমৎকার গল্প, যেখানে দরিদ্র বুদাই স্বপ্ন দেখে তার না খেতে পাওয়া ঘোড়াটি ঘোড়দৌড়ে জিতলে সে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ঘোড়াটির খুরের খাঁজে জোঁক ঢুকে যাওয়ায় সে দৌড়তে পারে না। বুদাই বুঝতে না পেরে প্রথমে নির্মমভাবে ঘোড়াটিকে পেটায়, তারপর নিজেই যেন প্রবল অসহায়তায় সেই ঘোড়াটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় আর ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতোই দৌড়তে আর সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে। 'ঘুম' গল্পে পিতা ও সন্তানের দাবা খেলা

অসম্পূর্ণ থেকে যায়, দেশভাগের আগের পূর্ববঙ্গে নিজের অতীতে হারিয়ে যেতে যেতে চিরঘুমের দেশে তলিয়ে যায় পিতা।

'মন্থরোর মা অথবা রাজধানীর গল্প'তে এসেছে রাজধানীবাসী এক সফল যুবকের জীবনে তার গ্রামের এক দরিদ্র, স্নেহশীলা বৃদ্ধার ছাপ রেখে যাওয়ার কথা। 'ভাঙন' গল্পে সন্তানকে নিয়ে এক পিতার নৌকোযাত্রার কথা। এক পারিবারিক ভাঙনে নাবালককে দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পগুলিতে এভাবেই ফিরে ফিরে আসে আমাদের চারপাশের জীবনের কথা। মানুষের দারিদ্র্য, অভাব, ক্ষুধা, অসহায়তা, ভাঙন, বিপন্নতার কথা কী গভীরভাবেই না আঁকেন তিনি! পাশাপাশি সমাজের মূল সমস্যাগুলিকে আমূল স্পর্শ করেন তিনি। শ্রেণি ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, সামাজিক, পারিবারিক ও মানবিক সম্পর্কের ভাঙন, জীবনে উঠে দাঁড়ানোর অদম্য প্রয়াস ও লড়াই, এইসব বিষয় ফিরে ফিরে এসেছে তাঁর গল্পগুলোয়।

খুব সূক্ষ্মভাবে, গভীর সংবেদনশীলতায়, তিনি স্পর্শ করেছেন জীবন ও মানুষকে। সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের পরিবেশ ও আবহকে। প্রায় কিছুই ঘটে না তাঁর গল্পগুলিতে। কিন্তু পাঠক চমকে উঠতে থাকেন। মামুলি জীবনেও যে এত আবিষ্কার থাকতে পারে, তা আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারে গভীরতর কোনও উন্মোচনে, তার সাক্ষী থাকতে থাকতে আমরা ভেসে যেতে থাকি নিরন্তর বিস্ময়ের স্রোতে। কী সূক্ষ্ম আর গভীরভাবেই না তিনি জানেন প্রান্তিক জীবনকে, তার উদ্বেগ এবং টানাপোড়েনকে, সেখানকার মানুষ, তাদের পরিবেশ, আচরণ এবং মুখের ভাষাকে, তাদের মেলামেশা, বিচ্ছিন্নতা এবং যাপনের খুঁটিনাটি দিককে!

গল্পলেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী আমাদের অবাক করে দেন, আর তাঁর গল্প আমাদের আত্মোন্মচনে সাহায্য করে। আমরা নিজেদের আরও ভালোভাবে চিনতে পারি। আমাদের বিভ্রমমোচন হয় এবং মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। তাঁর গল্প আমাদের নিজেদের যাচাই করতে ও বুঝে নিতে সাহায্য করে। মামুলি জীবন, কিন্তু মৌলিক ও তীব্র অন্তর্ভেদী ক্ষমতাসম্পন্ন দেখার চোখ। এই কারণেই তাঁর গল্পে জীবনটা এভাবে বেঁকেচুরে যায়, অদ্ভুত ও উদ্ভট হয়ে ওঠে। কোনও সাজানোগোছানো শৌখিনতার সামনে নয়, এই লেখক আমাদের নির্মম সত্যের সামনেই বারবার দাঁড় করিয়ে দেন।

লেখক পরিচিতি

কবি, কথাসাহিত্যিক, পত্রিকা সম্পাদক, গ্রন্থসমালোচক